ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৭
জুলাই : সেপ্টেম্বর ২০১৬

টেকসই উন্নয়ন : একটি ইসলামী বিশ্লেষণ

সাইয়েদ রাশেদ হাছান চৌধুরী*

Sustainable Development: An Islamic Analysis

ABSTRACT

The existence of a beautiful world cannot be imagined without considering socio-economic development and environment. Sustainable development is when an accelerated development process is maintained through a balance between the above two concepts and preserving a safe world for future generations. The United Nations has formulated sustainable development goals (2015-2030) to highlight the importance of the issue. Considering the importance of these matters, the government of Bangladesh also promulgated a national sustainable development strategy (2010-2021) in 2013. The prime objective of this study is to explain sustainable development strategy undertaken by the UN and the Bangladesh government and to explain the Islamic view related to the issue. Descriptive and analytic methods were followed in the preparation this article. Moreover, comparative methodology was also applied in specific cases. The research tries to show that the concept of sustainable development in Islam is wide and quite comprehensive and includes spiritual, moral and material dimensions at the same time. For this reason, it can easily be distinguished from the characteristics of western development model. In a capitalist societal framework, the prime objectives of sustainable development are to gain profit and to meet material needs. On the other hand, the prime objective of Islam in sustainable development is to ensure constructive production alongside the conservation of human values.

Keywords: Sustainable development; environment; National sustainable development strategy; Development in Islam; NSDS.

* স্নাতকোত্তর গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সার-সংক্ষেপ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশকে অবিবেচ্য রেখে একটি সুন্দর পৃথিবীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই দু'য়ের যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বিশ্ব সংরক্ষণ করে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় তাকে টেকসই উন্নয়ন বলে। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-২০৩০) প্রণয়ন করেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করেছে। এই অধ্যয়নের মূল লক্ষ্য জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত টেকসই উন্নয়ন কৌশলের বিশেস্নষণ এবং এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা। প্রবন্ধটি প্রণয়নে বর্ণনা ও বিশেস্নষণমূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে তুলনামূলক পদ্ধতিও প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইসলামে টেকসই উন্নয়ন ব্যাপক অর্থবোধক ও বিস্তৃত এবং তা নৈতিক দিকসহ আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কারণেই একে পশ্চিমা উন্নয়ন মডেলের বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। পুঁজিবাদী সমাজ শুধু মুনাফাকামিতা ও বস্তুগত চাহিদা পূরণকেই টেকসই উন্নয়নের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে, কিন্তু ইসলাম গঠনমূলক উৎপাদনের পাশাপাশি মানবীয় মূল্যবোধ রক্ষা করাকেও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

মূলশব্দ : টেকসই উন্নয়ন; জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র; ইসলামে উন্নয়ন।

ভূমিকা

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ ব্যতীত মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায়ও মানুষ পরিবেশের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারেনি। বিগত শতকের শুরুতে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পরিবেশ যতই দূষিত হোক না কেন প্রকৃতির নিয়মে তা আবার পরিশোধিত হবে। বিংশ শতকের ৬০-৭০ এর দশকে পরিবেশের দূষণ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে, পরবর্তীতে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিবেশ তাঁর নিজস্ব নিয়মে পরিশোধন হতে অক্ষম, মানুষকেই পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে। ২০১৫ সালে শেষ হতে যাওয়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অগ্রগতির ধারা আরো বেগবান করার অভিপ্রায়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে ১৫ বছর মেয়াদি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য বা Sustainable Development Goals (SDG)। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন শুধু বস্তুগত বিষয় নয়, বরং নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করে। এ উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনাকে অন্যসব টেকসই উন্নয়ন মডেল থেকে সহজেই পৃথক করা যায়।

টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন একটি সমসাময়িক পরিভাষা। স্থিতিশীল উন্নয়ন বা উন্নয়নের স্থিতিশীলতা উভয় ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Sustainable Development এবং আরবী প্রতিশব্দ التنمية المستدامة। পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হলো টেকসই উন্নয়ন। টেকসই উন্নয়ন বলতে শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ভোগ সীমিতকরণকেই বোঝায় না, বরং এটি সংখ্যালঘিষ্ঠের অটেকসই ভোগের কারণে বর্তমান প্রজন্মের অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়া যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তাও নিশ্চিত করে।[১] অতএব, টেকসই উন্নয়নের আরেকটি মাত্রা হচ্ছে আন্তপ্রজন্মগত সমতা। অন্যকথায়, টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমবণ্টন।

টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে এস. শচিমেডেইনি বলেন:

> Sustainable Development is a new concept of development that emphasises the integration of environmental conservation and economic growth. Previously, the concept of development was synonymous with economic growth, which can be quantified by certain parameters such as Gross Domestic Product (GDP). In fact, the concept of Malaysian Journal of Science and Technology Studies development has a wider meaning than the concept of growth because development means increase of quality of life while growth only emphasises increase of the economy.
>
> টেকসই উন্নয়ন হলো উন্নয়নের এমন এক নতুন ধারণা, যা পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে সমন্বয় সাধনে গুরুত্ব আরোপ করে। পূর্বে উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সমার্থবোধক হিসেবে বিবেচিত হতো, যা মূলত সুনির্দিষ্ট পরামিতি যেমন জাতীয় উৎপাদন (GDP) এর ভিত্তিতে পরিমাপ করা হতো। প্রকৃতপক্ষে, 'মালয়েশিয়ান জার্নাল অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্টাডিজ' এর দৃষ্টিতে উন্নয়নের ধারণা প্রবৃদ্ধির ধারণার চেয়ে ব্যাপকতর। কেননা উন্নয়ন অর্থ হলো, জীবন মানের উন্নয়ন পক্ষান্তরে প্রবৃদ্ধি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা।[২]

১. United Nations General Assembly, *Draft outcome document of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda*, www.un.org/disabilities/documents/gadocs/a_69_l.85.docx, retrieved 15 July 2016.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে:

> টেকসই উন্নয়ন মূলত একটি প্রক্রিয়া, যা দ্বারা জনগণ তাদের চাহিদা মেটায়, তাদের বর্তমান জীবন মানের উন্নতি ঘটায় এবং সেই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে তাদের আপন চাহিদা পূরণ করতে পারে তাদের সেই সামর্থ্যের সুরক্ষা করে।[৩]

আর. ই. মুন টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন:

> The meaning of development in Sustainable Development refers to the quality enhancement of human and other spheres by achieving their basic needs. Clearly, the concept of development here has a more comprehensive meaning than economic growth.
>
> টেকসই উন্নয়নে উন্নয়নের পরিভাষাটি মানব জাতির মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদের জীবন মান ও অন্যান্য সূচকের বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। বস্তুত এখানে উন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক।[৪]

টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দিক রয়েছে। এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মানুষের বাঁচার ন্যূনতম প্রয়োজন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, পানি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রয়োজন মিটানো এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা;
২. জনসংখ্যাকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ধরে রাখা;
৩. আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি পুনবণ্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ;
৪. খনিজ সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে তার আবর্তনের উপর জোর দেয়া;
৫. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মাধ্যমে ভোগ;

২. S. Schmidheiny, *Changing Course: A Global Business Perspective on Development and Environment* (London: MIT Press, 1992), P. 373.

৩. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, *জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০২০-২০২১)*; (ঢাকা: পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ২০১৩), পৃ. ০৫

৪. R. E. Munn, "Towards Sustainable Development: An Environmental Perspective" in *Economics and Ecology: Towards Sustainable Development*. ed. F. Archibugi, and P. Nijkamp (Dordrecht: Kluwer Academic Publications 1990), p. 25.

৬. পানি ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে রাখা;

৭. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপর জোর দেয়া;

৮. গ্রাম উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া, যাতে গ্রামের লোকেরা নিরন্তর শহরের দিকে না আসে;

৯. সুষম ভূমি ব্যবহার এবং তা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আনা;

১০. শক্তি তথা এনার্জির ক্ষেত্রে পুনর্নবায়নযোগ্য উৎসের ওপর নির্ভর করা।[৫]

অতএব বলা যায়, পরিবেশকে ভিত্তি করে সংঘটিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়ন। অর্থাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জিত হয়। যার লক্ষ্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, যেখানে প্রতিটি মানুষ উন্নয়নে অবদান রাখার ও এর সুফল ভোগের সুযোগ লাভ করে এবং একই সময়ে তারা প্রাকৃতিক ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা সহ সংরক্ষণ করে থাকে।

টেকসই উন্নয়নের ধারণা

জাতিসংঘ পরিবেশের বিষয়ে মুখ্য অধিবক্তা এবং টেকসই উন্নয়ন এর নেতৃস্থানীয় প্রচারকের দায়িত্ব পালন করছে। আন্তর্জাতিক আলোচ্যসূচিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের অবনতির বিষয়টি প্রথমে উপস্থাপিত হয় ১৯৭২ সালের ৫-১৫ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment)-এ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক বিশ্ব কমিশন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের কাছে এ কমিশনের ১৯৮৭ সালের প্রতিবেদনেই উন্মুক্ত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিকল্প পথ হিসেবে টেকসই উন্নয়নের ধারণা উপস্থাপিত হয়। এ প্রতিবেদন বিবেচনা করে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলন আহবান করে।[৬] ১৯৯২ এর ইউএনসিইডি-তে রিও ঘোষণায় টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য মোট ২৭টি নীতিমালার অনুমোদন করা হয়। ২০০২ সালের ২৬ আগস্ট - ৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে (World Summit on Sustainable Development-WSSD) রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা এজেন্ডা ২১ বর্ণিত টেকসই উন্নয়নের নীতি এবং

৫. World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*. (Oxford: Oxford University Press, 1987), p. 27.

৬. United Nations -Sustainable Development knowledge platform, "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=111&nr=8496&menu=35, Retrieved 23 July 2016

অন্যান্য বিধিমালার বিষয়ে পুনরায় ঐকমত্য হয়। সম্মেলনে মোট ৩৭ টি ঘোষণার কথা বলা হয়।[৭] সিউলে ২০০৫ এ অনুষ্ঠিত "এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পরিবেশ ও উন্নয়ন" শীর্ষক পঞ্চম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণা গৃহীত হয়, যেখানে পরিবেশগতভাবে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (সবুজ প্রবৃদ্ধি) অর্জনের কর্মকৌশলের ওপর আলোকপাত করা হয়।

টেকসই উন্নয়নের মূলনীতি

টেকসই উন্নয়ন মূলত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা এমডিজি[৮]-র মতো জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত একটি উন্নয়ন পরিক্রমা, যা ২০১৫ সালের পর এমডিজি-র স্থলে প্রতিস্থাপিত হয়। ৩-১৪ জুন ১৯৯২ ব্রাজিলের রি ও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০-২২ জুন ২০১২ অনুষ্ঠিত হয় রিও+ ২০ (Rio+২০) বা আর্থ সামিট ২০১২ (Earth Summit 2012) সম্মেলন, যার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন বা World Sustainable Development Conferences (WSDC)। এ সম্মেলনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বা Sustainable Development Goals (SDGs)- গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক কনফারেন্স -এ (রিও+ ২০) ৭৯ জন সরকার প্রধানসহ ১৯১ টি জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। কনফারেন্স-এর ফলাফল সংবলিত দলিল 'দি ফিউচার উই ওয়ান্ট' এ টেকসই উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়[৯] এবং কিভাবে তা অর্জন করা যায় সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। ১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে বাস্তবায়ন শুরু হওয়া এসডিজি (SDGs))'র লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ২০৩০ সাল।[১০]

৭. UN General Assembly Creates Key Group on Rio+20 Follow-up, *Press Release United Nations Division for Sustainable Development*, https://sustainabledevelopment.un.org/futurewe want.html. retrieved 26 February 2016.

৮. ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। ১৭৪ টি দেশ এতে ২০১৫ সালের মধ্যে ৮ টি লক্ষ্য পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যা 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (Millennium Development Goal-MDG) নামে পরিচিত।

৯. Fan, Shenggen and Polman, Paul. 2014. An ambitious development goal: Ending hunger and under nutrition by 2025. *In 2013 Global food policy report*. Eds. Marble, Andrew and Fritschel, Heidi. Chapter 2. Pp 15-28. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute (IFPRI).

১০. "*Technical report by the Bureau of the United Nations Statistical Commission (UNSC) on the process of the development of an indicator framework for the goals and targets of the post-2015*

২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য পুরোপুরি দূর করা এবং বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নতুন টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের খসড়া রোডম্যাপ ২ আগস্ট, ২০১৫ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের ১৯৩ টি সদস্য দেশ দীর্ঘ তিন বছরের আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে ১৭ টি লক্ষ্য সামনে রেখে ৩০ পৃষ্ঠার এ খসড়া গ্রহণ করে। এর নামকরণ করা হয় Transforming our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development. ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শীর্ষ নেতারা চরম দারিদ্র্যমুক্ত, পরিবেশ সুরক্ষিত ও নিরাপদে বসবাসে উপযোগী বিশ্ব তৈরির লক্ষ্যে উপরিউক্ত এজেন্ডা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে।

টেকসই উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য

২০৩০ সালের লক্ষভেদী টেকসই উন্নয়নের রোডম্যাপের প্রধান লক্ষ্য ১৭টি; সূচক ৪৭টি ও সহযোগী লক্ষ্য ১৬৯টি। নিম্নে ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রা সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হলো:

লক্ষ্যমাত্রা-১: দারিদ্র্যের অবসান (Poverty Allevation) বেকারত্বের মতো দিকগুলো থেকে সমাজের প্রত্যেকের সুরক্ষা, সকলের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। মৌলিক সেবাসমূহ তথা শ্রম, ভূমি, প্রযুক্তিতে স্বল্প পুঁজির লোকদের সম-সুযোগ নিশ্চিতকরণে এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতার জন্য যেসব সামাজিক নীতিমালা সহায়তা করে সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বণ্টন নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-২: ক্ষুধামুক্তি ও খাদ্য নিরাপত্তা (Hunger and Food Security) প্রতিটি শিশুর স্বাস্থ্যকরভাবে বেড়ে উঠার জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা, ক্ষুধা দূর করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পুষ্টি বাড়ানো এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির প্রচলন।

লক্ষ্যমাত্রা-৩: সুস্বাস্থ্য (Good Health and Well-Being)। সব বয়সী মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনমান নিশ্চিত করা এবং মরণঘাতী রোগ থেকে মুক্ত থাকা।

লক্ষ্যমাত্রা-৪: শিক্ষা (Education)। সবার জন্য ন্যায্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সকলের জন্য সব বয়সে শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৫: লিঙ্গসমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন (Gender Equality and Women's Empowerment)। লিঙ্গসমতা অর্জন এবং সব নারী ও বালিকার ক্ষমতায়ন করা।

---

development agenda - working draft" (PDF). March 2015. Retrieved 1 May 2015.

লক্ষ্যমাত্রা-৬: সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (Water and Sanitation) সবার জন্য পানি ও পয়ঃব্যবস্থার প্রাপ্যতা ও তার টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৭: নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী (Energy)। সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৮: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)। সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন ও উৎপাদনশীল এবং যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

লক্ষ্যমাত্রা-৯: অবকাঠামো ও শিল্পায়ন (Infrastructure, Industrialization) অবকাঠামো নির্মাণ, সবার জন্য ও টেকসই শিল্পায়ন গড়ে তোলা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-১০: বৈষম্য হ্রাস (Inequality)। দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তদেশীয় বৈষম্য হ্রাস করা, বিশেষ করে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল ভোগের জন্য দরিদ্রদের সহায়তা প্রদান করা।

লক্ষ্যমাত্রা-১১: টেকসই নগর ও সম্প্রদায় (Sustainable cities and communities)। নগর ও মানব বসতির স্থানগুলো সবার জন্য, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা।

লক্ষ্যমাত্রা-১২: সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার (Sustainable Consumption and Production)। টেকসই ভোগ ও উৎপাদন প্যাটার্ন নিশ্চিত করা ।

লক্ষ্যমাত্রা-১৩: জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ (Climate Change)। জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

লক্ষ্যমাত্রা-১৪: টেকসই মহাসাগর (Sustainable Oceans)। টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

লক্ষ্যমাত্রা-১৫: ভূমির টেকসই ব্যবহার (Biodiversity, Forests, Deforestation)। ভূপৃষ্ঠের জীবন পৃথিবীর ইকোসিস্টেম সুরক্ষা, পুনর্বহাল করা এবং এর টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা করা, মরুকরণ রোধ, ভূমিক্ষয়বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন বন্ধ করা

লক্ষ্যমাত্রা-১৬: শান্তি ও ন্যায়বিচার (Peace and Justice)। টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরা, সবার ন্যায়বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

লক্ষ্যমাত্রা-১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব (Partnership)। লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অংশীদারিত্ব বাস্তবায়ন কৌশলগুলো আরো কার্যকর করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জাগরিত করা।[১১]

জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১)

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) এক সভায় টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিবেশ নিরাপত্তা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রথমবারের মতো ১০ বছর মেয়াদি জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Sustainable Development Strategy-NSDS) নামের একটি উন্নয়ন দলিল অনুমোদন দেয়া হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রি ও ডি জেনেরিওতে অবস্থিত জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব সদস্য এ ধরনের জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল গ্রহণে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এ কৌশল গ্রহণ করেছে। এ কৌশলপত্রের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১০-২০২১ সাল পর্যন্ত। দেশের উন্নয়ন যাতে স্থিতিশীল হয় সে জন্য এ কৌশলপত্র একটি রোডম্যাপ। কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন। এতে দেশের সব খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

উৎপাদনশীল সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী টেকসহিতা চ্যালেঞ্জের সমাধানসহ কৌশলপত্রে বিবৃত রূপকল্প অর্জনের জন্য এনএসডিএস (২০১০-২০২১) তিনটি পারস্পরিকভাবে সম্পৃক্ত ক্ষেত্রসহ পাঁচটি কৌশলগত অগ্রাধিকার ক্ষেত্র চিহ্নিত করে। কৌশলগত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলোর উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। যে তিনটি পারস্পরিকভাবে যুক্ত বিষয়াবলি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাগুলোর টেকসই উন্নয়নে সহায়তা দান করবে সেগুলো হলো, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু, সুশাসন এবং জেন্ডার। কৌশলগত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কাজ করবে টেকসই উন্নয়ন পরিবীক্ষণ পরিষদ (এসডিএমসি)। নিম্নে পারস্পরিক সম্পৃক্ত ক্ষেত্র ও কৌশলগত অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে:

১. অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

পরিবেশগত টেকসহিত্বের প্রশ্নে কোন আপস ছাড়াই মধ্যম আয়ের মর্যাদায় অর্থনীতির রূপান্তরসহ উন্নততর জীবন মান, দ্রুত দারিদ্য নিরসন ও কর্মসৃজন নিশ্চিত

[১১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview.html

করার জন্য ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধিকে প্রধান উন্নয়ন কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবকাঠামো কর্মসূচি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তিতে সরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং বিনিয়োগ প্রণোদনা বিনিয়োগ-পরিবেশ উন্নয়নসহ পিপিপি প্রবর্ধনে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে, শিক্ষা ও দক্ষতা শিক্ষণের মানসহ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বৈদেশিক কর্ম সংস্থানের প্রসার, জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সবুজ প্রবৃদ্ধি প্রবর্ধনের মাধ্যমে অব্যাহত ও ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব।

২. অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহের উন্নয়ন

দেশের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহের মধ্যে রয়েছে, কৃষি, শিল্প, জ্বালানি, পরিবহন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। এ খাতগুলোর জন্য সুপারিশকৃত কৌশলে অর্থনীতিকে সঠিক নির্দেশনা দানের উপর জোর দেয়া হয়েছে, কেননা এ খাতগুলোই আগামীতে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি থাকবে এবং দেশের টেকসই উন্নয়নে সহায়তা দান করবে।

৩. নগর পরিবেশ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে যেহেতু দ্রুত নগরায়ণ অপ্রতিরোধ্য, সুতরাং টেকসই নগর উন্নয়নের ওপর নানাদিক থেকেই দেশের টেকসই উন্নয়ন নির্ভরশীল। এই অংশে নগরাঞ্চলের টেকসই উন্নয়নে পাঁচটি প্রধান বিষয়ে সমাধান অন্বেষণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো, নগর গৃহায়ন, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, দূষণ ব্যবস্থাপনা, নগর পরিবহণ এবং নগর ঝুঁকি হ্রাস।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সকল নাগরিকের অনুকূলে মানসম্মত ও ন্যূনতম মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবার অধিকার এবং সেই সাথে সেবা ও ইউটিলিটি সেবা তাদের জন্য সহজলভ্য করা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, নারীদের অগ্রগতি ও অধিকার, শিশুদের অগ্রগতি ও অধিকার, বয়োবৃদ্ধ এবং অসমর্থ মানুষের জন্য বিশেষ সেবা দান, কর্মসংস্থান সুযোগের বিস্তৃতি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও সুবিধাবলিতে অ্যাকসেস বৃদ্ধি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এগুলো সামাজিক উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। বস্তুত সামাজিক উন্নয়ন টেকসই উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তিসমূহের অন্যতম।

৫. পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

এই কৌশলগত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকার প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলির অন্যতম হলো, প্রাকৃতিক সম্পদের দক্ষ ব্যবহারসহ এর সংরক্ষণ ও উন্নয়নে যথাযথ গুরুত্ব দান সহ

মানব, ইকোসিস্টেম ও সম্পদের জন্য পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ; পানি সম্পদ, বন ও জীববৈচিত্র্য, ভূমি ও মাটি , উপকূলীয় ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন এর আওতাভুক্ত।

৬. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এলাকা

জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রের কৌশলগত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এলাকাগুলোতে সহায়তা দিতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা শনাক্ত করা হয়েছে। পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত এই এলাকাগুলি হলো, সুশাসন, জেন্ডার এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন। এটি প্রতীয়মান হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা উপেক্ষা করে সামগ্রিকভাবে টেকসই উন্নয়ন কখনো অর্জন করা সম্ভব নয়।

৭. সুশাসন

সুশাসন খাতে গহীত কৌশলের উদ্দেশ্য হলো একটি কার্যকর সংসদীয় ব্যবস্থা, উপযুক্ত আইন ও শৃংখলা, গণমুখী ও দক্ষ সরকারি সেবা বিতরণ, স্বাধীন, মুক্ত, স্বচ্ছ, ও জবাবদিহিতামূলক আইন ও বিচার ব্যবস্থা, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার এবং সার্বিকভাবে সমাজিক ন্যায়বিচারসহ একটি দুর্নীতিমুক্ত সমাজ নিশ্চিত করা। কৌশলপত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি, প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সংস্কার, দুর্নীতি দমন, পরিকল্পনা ও বাজেটিং-এর দক্ষতা বৃদ্ধি, আর্থিক খাত পরিবীক্ষন, ই-শাসনের প্রবর্তন, তথ্যে অ্যাকসেস নিশ্চিতকরণ এবং সমাজে মূল্যবোধ ও নৈতিকতা পুনঃপ্রচলনের ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে।

৮. জেন্ডার

জেন্ডারের বিভিন্ন দিক, বিশেষ করে নারীদের অগ্রগতি ও অধিকার বিষয়ে এই রিপোর্টের সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা অংশে প্রাথমিকভাবে অঙ্গীভূত হয়েছে।[১২]

চিত্র ১-এ এনএসডিএস কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে যাতে পারস্পারিকভাবে সম্পৃক্ত ক্ষেত্র ও কৌশলগত অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে।

[১২] জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১), পৃ. ১৩-২০

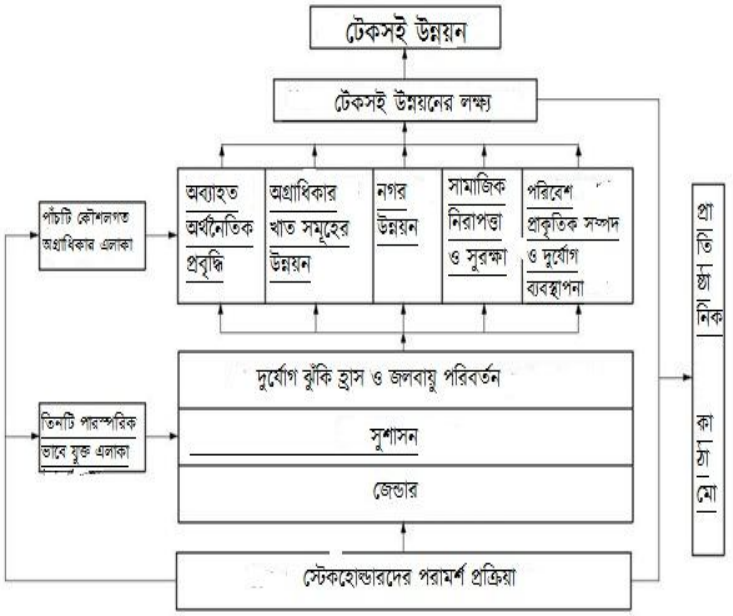

চিত্র-১ : জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল কাঠামোর প্রবাহচিত্র[১৩]

অতএব, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র ২০১০-২০২১ এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে টেকসই উন্নয়নের যেসব মৌলিক দিক ফুটে ওঠে তা হলো:

ক. মৌলিক অধিকার;

খ. পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার;

গ. শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার;

ঘ. বৈষম্য দূরীকরণ;

ঙ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;

চ. অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন;

ছ. মানবসম্পদ উন্নয়ন।

[১৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

ইসলামের দৃষ্টিতে টেকসই উন্নয়ন

ইসলাম মানুষের সব ধরনের চাহিদার ব্যাপারে সার্বিক বা পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করে। ফলে ইসলাম টেকসই উন্নয়নকেও তার দৃষ্টিসীমার বাইরে স্থান দেয়নি। ইসলামের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান, এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এবং দুনিয়ার সুযোগ সুবিধা বা নেয়ামত ভোগ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত। ইসলামী নীতিমালায় সরকার ও সমাজের অর্থনৈতিক আচরণ বা তৎপরতা এবং সামাজিক পরিবেশকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে, এর ফলে টেকসই ও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয়। ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক তৎপরতায় মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ বা বিধানগুলোর ভূমিকা রয়েছে।এ কারণে ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক তৎপরতাগুলো সুস্থ পরিবেশে এবং সঠিক নীতিমালা বা বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

এম খালফান টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করতে যেয়ে বলেন:

> Sustainable development from Islamic perspective seeks to establish a balance between the environment, economic and social dimensions. It means the balance of consumer welfare, economic efficiency, achievement of ecological balance in the framework of evolutionary knowledge-based, and socially interactive model defining the social justice, charity and zakat are two mechanisms to reduce poverty.
>
> টেকসই উন্নয়নকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলে আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম পরিবেশ, অর্থনীতি এবং সামাজিক গতিবিধির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ভোক্তার কল্যাণ, অর্থনৈতিক পর্যাপ্ততা এবং অভিব্যক্তিমূলক জ্ঞান ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বিভিন্ন মডেল তথা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র হ্রাসকারী দুটি বিশেষ কৌশল তথা বদান্যতা ও যাকাত ভিত্তিক পরিকাঠামোতে পরিবেশগত ভারসাম্য অর্জন।[১৪]

উন্নয়নের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। মানুষ যেসব সম্পদ ভোগ করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তার প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ। তিনি মানুষকে অন্য সব সৃষ্টির চেয়ে বেশি মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন এবং পৃথিবীর সব কিছু মানুষের আওতাধীন করেছেন, যাতে মানুষ তার প্রতিনিধিত্বের

১৪. M. Khalfan, (2002), "Sustainable Development and Sustainable Construction", *A literature Review for C-SanD,* pp1-45.

দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে। এরই আলোকে ইহকাল ও পরকালে মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার আচার-আচরণের প্রকৃতির ওপর। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا ﴾

আমরা আদম সন্তানদের মর্যাদা দিয়েছি, ভূভাগে ও সাগরে তাঁদের জন্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করেছি এবং তাদেরকে পবিত্র জীবিকাসমূহ দিয়েছি এবং আমি অন্য যতকিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।[১৫]

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ মানুষের প্রতি মহান আলস্নাহর অনুগ্রহ মাত্র, যাতে মানুষ একদিকে তাদের চাহিদাগুলো পুরণ করতে পারে ও এভাবে নিজেকে উন্নত করার সুযোগ পেতে পারে এবং অন্যদিকে তাকওয়া বা খোদাভীরুতা অবলম্বনের মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিগুলো দমন করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

হে মানবজাতি! জমিনে যা কিছু আছে তা থেকে বৈধ ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং শয়তানের পদক্ষেপের অনুসরণ করো না, কারণ, সে অবশ্যই তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১৬]

ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ খোলা রেখেছে। কিন্তু ইসলামের কাঙ্ক্ষিত টেকসই উন্নয়ন মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই কিছু নিয়ম কানুন ও নীতিমালা দ্বারা বেষ্টিত। মানুষ যাতে বস্তুগত বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে ছুটতে যেয়ে লোভ-লালসা, অপচয়, জুলুম ও অত্যাচারে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্যেই এই সীমারেখা বা সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে। একজন মানুষের জন্যে দুনিয়া ও এর সম্পদগুলো তখনই অপছন্দনীয়, যখন তা তাকে খোদাদ্রোহিতার দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে সে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও জুলুমের অতল গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়।

টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে হাসান যুবায়ের বলেন:

> Human beings are God Almightys representatives on the planet Earth, and they are entitled to benefit from its resources without selfishly monopolizing them. Human beings must

১৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

১৬. আল-কুরআন, ২ : ১৬৮

seek to develop this planet in accordance with the provisions of the Holy Quran and the teachings of Prophet Muhammad, with the stipulation that current needs must be met without jeopardizing the rights of future generations.

মানব জাতি এই পৃথিবী নামক গ্রহে মহান আল্লাহর প্রতিনিধি এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সম্পদ একচেটিয়াভাবে ভোগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানব জাতি অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মুহাম্মদ স.-এর শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সমসাময়িক চাহিদা পূরণ করবে এবং উন্নতির চেষ্টা করবে তবে ভবিষ্যত প্রজন্মের কোন অধিকার যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখবে।[১৭]

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন ও জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রের মূলনীতিসমূহের সাথে ইসলামের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। পূর্বের আলোচনা থেকে টেকসই উন্নয়নের যে ৭টি গুরুত্বপূর্ণ দিক ফুটে উঠেছে নিম্নে ইসলামের আলোকে তার ব্যাখ্যা বিধৃত হলো:

এক. মৌলিক অধিকার

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মত মানুষের মানবিক মৌলিক অধিকারসমূহের উন্নয়নই টেকসই উন্নয়নের মূল উদ্দেশ্য। টেকসই উন্নয়নের সব মডেলেই মৌলিক অধিকারসমূহকে মূল অনুষঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলাম মানুষের মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। মহান আল্লাহ মানব জাতির পিতামাতা আদম ও হাওয়া আ.-এর সৃষ্টির পরপরই তাদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন এবং তাদের আবাসস্থল হিসেবে জান্নাতকে নির্ধারণ করেন। সেখানে তাদের সব ধরনের প্রয়োজনের প্রাপ্তি ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى - وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى ﴾

তোমার জন্য এটাই থাকল যে, তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত হবে না, নগ্নও হবে না। নিশ্চয় তুমি সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।[১৮]

ফলে এ ব্যবস্থায় সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হয়। নাগরিকদের এ দাবি পূরণকে শাসক তার কর্তব্য মনে করেন। রাষ্ট্রের সকল সদস্য এর দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। আবার ব্যক্তি নিজেও নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকে না। বরং কারো সহযোগিতা

১৭. Zubair Hasan, "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications and Policy Concern". *JKAU: Islamic Econ*. 19(9): 3-18

১৮. আল-কুরআন, ২০ : ১১৮-১১৯

ছাড়াই নিজের জীবন নির্বাহের চেষ্টা করে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের মৌলিক অধিকার ও তা অর্জনের পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. দারিদ্রের অবসান ও সকলের জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা: জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে যেসব লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে দারিদ্রের অবসান ও ক্ষুধামুক্তি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র অকল্যাণকর, যা অনেক সময় মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়। শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখিয়ে মানুষকে বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হতে প্ররোচনা দেয়। আল্লাহ বলেন:

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[১৯]

এ কারণে ইসলাম দারিদ্রের অবসানের জন্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একদিকে সম্পদ যাতে সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে সীমিত না হয়ে যায় তার জন্য সম্পদের আবর্তনের উপর জোর দেয়[২০], অন্যদিকে সমাজ বা রাষ্ট্রে যাতে কোন প্রকার অসহায় লোক না থাকে তার জন্য ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার নিশ্চিত করে।[২১]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষসহ সকল প্রাণীর খাদ্য গ্রহণের অধিকার রয়েছে। মহান আলস্নাহ এ অধিকার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেন। আলস্নাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

আর পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযক (পৌঁছানোর দায়িত্ব) আল্লাহর ওপর নেই। তিনি জানেন, তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। এ সবকিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে।[২২]

আর্থিক অসঙ্গতি বা অন্য কোনো কারণে কেউ যদি খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ হয়, তবে তাকে সহযোগিতা করা সামার্থ্যবানদের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ স. এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الإِسْلامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

১৯. আল-কুরআন, ২ : ২৬৮

২০. আল্লাহর বাণী: كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ "যাতে সম্পদ তোমাদের মধ্যকার ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।" আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

২১. আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ "এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।", আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

২২. আল-কুরআন, ১১ : ৬

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. কে জিজ্ঞাসা করল? ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, অপরকে খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিতকে সালাম জানানো।[২৩]

২. সুস্বাস্থ্য: টেকসই উন্নয়নে জাতিসংঘ সব বয়সী মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনমান নিশ্চিত করতে গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামও মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. মদিনা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্বারোপ করে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রবর্তন করেন। এসময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন হারিস ইবনে কালাদাহ আসসাকাফী ও আবূ আবী রামসাহ আততামীমী প্রমুখ। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. মুসলমানদেরকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন আজকের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা তা পড়ে অবাক না হয়ে পারে না। মদীনা রাষ্ট্রে গণস্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। রোগীদের দেখাশোনা, সেবা-শুশ্রূষা এবং মৃত ব্যাক্তির দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ ও এসব কাজ সম্পাদন করাকে রাসূলুল্লাহ স. ঈমানী দায়িত্বে পরিণত করেছেন। দেহ সুস্থ এবং আত্মার কল্যাণের জন্য হালাল ও পবিত্র তথা স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হালাল খাদ্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا ﴾

হে মানব ম-লী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর।[২৪]

৩. শিক্ষা: শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ মানব সম্পদে পরিণত হয়। একটি দক্ষ ও উন্নত মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য শর্ত। ইসলাম বিদ্যাশিক্ষাকে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরয করে দিয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ﴾

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত বা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। আর বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে।[২৫]

২৩. আল-বুখারি, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ : বাবুল ইতামুত তা'আমে মিনাল ইসলাম, হাদীস নং ১২

২৪. আল-কুরআন, ২ : ১৬৪

২৫. আল-কুরআন, ২ : ২৬৯

৪. সুপেয় পানি: পানির অপর নাম জীবন। সব প্রাণীর জীবনই পানি থেকে তৈরি।[২৬] মহান আল্লাহ সকলের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ – أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ – لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ﴾

তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?[২৭]

ইসলামে পানির অধিকার হলো তার পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করা এবং অপব্যবহার ও অপচয়ের হাত থেকে তাকে রক্ষা করা।

৫. জীবনের নিরাপত্তা: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবনের নিরাপত্তা পাওয়া তার মৌলিক অধিকার। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা সকল অন্যায় হত্যাকা- হারাম করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ ﴾

যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তোমরা তাকে হত্যা করো না। তবে আইনসম্মত হত্যার কথা স্বতন্ত্র।[২৮]

৬. সম্মানের নিরাপত্তা: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা মানুষের মান-সম্মান, সম্ভ্রমের সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধান করে। বরং সম্মানের নিরাপত্তাকে তার মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে। এ কারণে অপরের সম্মানহানি হতে পারে এমন সব কথা ও কাজ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে পরচর্চা, মিথ্যা অপবাদ আরোপ, মন্দ নামে ডাকা, দুর্নাম, দোষারোপ করা। ঘরে ব্যক্তির সাবলীল ও শান্তিপূর্ণ বসবাস নিশ্চিত করার জন্যে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে এসব বিষয়ে আলোকপাত করে আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ – يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾

২৬. আল্লাহ বলেন: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ "এবং প্রাণযুক্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" আল-কুরআন, ২১ : ৩০

২৭. আল-কুরআন, ৫৬ : ৬৮-৭০

২৮. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৩

হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি জঘন্য। যারা তওবা না করে তারাই জালিম। হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাক; কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চায়? বস্তুত তোমরা তো ঘৃণ্যই মনে কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।[২৯]

৭. ধর্ম পালনের স্বাধীনতা: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির তার নিজের ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে এবং এটি তার মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾

ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। সত্যপথ মিথ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে গিয়েছে।[৩০]

দুই. পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

মানুষ ও পরিবেশ একে অপরের পরিপূরক। কেননা মানুষের আচার ব্যবহার পরিবেশ কর্তৃক প্রভাবিত হয় এবং এর ভিত্তিতে মানুষের জীবন যাত্রার মান পরিচালিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব বিধায় একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হয়, যাতে মানুষ কর্তৃক পরিবেশের কোনরূপ বিপর্যয় না হয়। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ও জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র পরিবেশ দূষণ রোধ করে এর সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহার প্রসংগে নবায়নযোগ্য জ্বালানী, অবকাঠামো ও শিল্প উন্নয়ন, টেকসই নগর ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা, ভূমির টেকসহিত্ব ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামও এসব বিষয়ের বিস্তারিত নীতিমালা প্রদান করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা উলেস্নখ করা হলো:

১. পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তন: মানুষ তার অগ্রযাত্রায় পরিবেশ থেকে নানা উপকরণ গ্রহণ করছে প্রতিনিয়ত। পরিবেশের নানা উপাদানকে মানুষ তার প্রয়োজনে

২৯. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১-১২
৩০. আল-কুরআন, ২ : ২৫৬

যথেচ্ছা ব্যবহার করার ফলে এর বিপর্যয় ও পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। ইসলাম পরিবেশ দূষণের কারণসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾

স্থলে ও সমুদ্রে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কতিপয় কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।[৩১]

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে ইসলাম নীতিমালা নির্ধারণ করেছে, নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

ক. বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণ: পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য রক্ষায় ও দূষণমুক্ত সবুজ পরিবেশ তৈরিতে বৃক্ষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মহানবী স. পরিবেশ বিপর্যয়রোধে বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন:

ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

যদি কোনো মুসলিম একটি বৃক্ষরোপণ করে অথবা কোনো শস্য উৎপাদন করে এবং তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা উৎপাদনকারীর জন্য সদকাহ (দান) স্বরূপ গণ্য হবে।[৩২]

খ. পানিতে ও বাতাসের বিপরীতে মলমূত্র ত্যাগ নিষেধ: পানিতে মলমূত্র ত্যাগ পানিকে দূষিত করে, যা পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এ জন্য ইসলাম বদ্ধ পানিতে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহ স. এ সম্পর্কে বলেছেন:

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه

তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে, (কারণ হয়তো) পরে সে ঐ পানিতে উযূ করবে।[৩৩]

একইভাবে ইসলাম বাতাসের বিপরীত দিকেও প্রস্রাব না করার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা এর দ্বারা বায়ু দূষণ হয় এবং তা জামা কাপড়ে লাগার উপক্রম হয়।

গ. মৃত জন্তুকে পুঁতে রাখা: মৃত প্রাণী পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পরিবেশকে দুষিত করে এক সময় বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করে। ফলে ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মৃত প্রাণীকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হয়।[৩৪]

৩১. আল-কুরআন, ৩০ : ৪১
৩২. আল বুখারী, আস-সহীহ, অধ্যায় : কিতাবুল হারজে ওয়াল মুযারাত, পরিচ্ছেদ : বাবুল ফাদলে যারইে ওয়াল গারজ ইযা আকালা মিনহু, হাদীস নং - ২৩২০
৩৩. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, আস-সুন্নান, অধ্যায় : কিতাবুত তাহারাত আন রাসুলুল্লাহ স., পরিচ্ছেদ: বাবু মা যাআ ফি কারাহিয়াতুল বাউলে ফিল মাইর রাকিদে, হাদীস নং ৬৮

ঘ. হাঁচির সময় মুখ ঢেকে রাখা: হাঁচির সাথে শরীরের ভিতর থেকে অসংখ্য জীবাণু বের হয়, যার কারণে পরিবেশ দূষিত হয়। বিধায় ইসলাম হাঁচি দেওয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখার বিধান প্রবর্তন করেছে।[৩৫]

ঙ. পরিবেশ দূষণ ঈমানের পরিচায়ক নয়: পরিবেশ দূষিত করা ঈমানের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত। কেননা পরিবেশ দূষণকারী এর দ্বারা অন্যকে কষ্ট প্রদান করে এবং নিজেও কষ্ট পায়। অথচ অন্যকে কষ্ট দেয়া মুসলিমের পরিচায়ক নয়।

রাসূলুল্লাহ স. বলেন:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

সেই প্রকৃত মুসলিম যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।[৩৬]

২. প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার: অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়নের ধারণায় প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর ব্যবহারকে যৌক্তিক সীমার মধ্যে সীমিত রাখা, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলের অংশগ্রহণ এবং জনগণের সহানুভূতি, ন্যায় বিচার ও ভারসাম্য- এসব বিষয় মৌলিক চাহিদা হিসেবে বিবেচিত হয়। ইসলাম প্রাকৃতিক সম্পদকে

৩৪. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾

"আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল, যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বলল: আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল।" আল-কুরআন, ৫ : ৩১

৩৫. মহানবী স. বলেন:

إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাঁই তোলাকে অপছন্দ করেন। অতএব, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ হাঁচি দেয়, তোমরা তখন আলহামদুলিল্লাহ বলবে, আর যে আল হামদুলিল্লাহ শুনবে সে যেন ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম বর্ষণ করুন)। হাঁই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে, আর যখন তোমাদের কেউ হাঁই তোলে, সে যেন তা প্রতিহত করার চেষ্টা করে। কারণ, হাইতোলার উপক্রম হলে শয়তান হাঁসতে থাকে। সূত্র: আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদাব, পরিচ্ছেদ : ইযা তাসাওবা ফালিয়াদু ইয়াদাহু আলা ফিহে, হাদীস নং ৫৮৭২।

৩৬. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল ঈমান, পরিচ্ছেদ : আল মুসলিমু মান সালেমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ও ইয়াদিহি, হাদীস নং ১০

যথাযথ প্রক্রিয়ায় এবং অপচয় রোধ করে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে। নিম্নে এ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা উল্লেখ করা হলো:

ক. মহাসাগর ও পানি: ইসলামের দৃষ্টিতে পানির পরিমাণ সীমিত, তাই এর দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾

আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণমত, অতঃপর আমি জমীনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম।[৩৭]

খ. ভূমির টেকসহিত্ব: ভূমি মানুষের জীবিকা অর্জন ও উৎপাদনের একটি অপরিহার্য মাধ্যম। ইসলামও ভূমির মালিকানা ও ব্যবহারের বিস্তারিত নীতিমালা উপস্থাপন করেছে। যার মধ্যে পতিত জমি আবাদ করা, জমিতে পানি সেচ ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ. প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যথার্থ করার জন্য এতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং এর এক পঞ্চমাংশ সরকারী কোষাগারে জমার বিধান রাখা হয়েছে। একইভাবে ভূমিতে মানুষের ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়া হলেও তা থেকে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তিন: শান্তি নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার

টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সবার ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও গুরুত্বারোপ করেছে। সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম প্রথমত মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত আইনের শাসন প্রয়োগ করে তা বাস্তবায়নে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যাতে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি শেস্নাগান সর্বস্ব না হয়ে অর্থবহ এবং বাস্তব হয়ে ওঠে। ইসলাম ন্যায়বিচারকে উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে গণ্য করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾

তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করো, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট? আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।[৩৮]

৩৭. আল-কুরআন, ২৩ : ১৮

ইসলাম ন্যায়বিচার, সদাচার ও প্রয়োজনীয় বিধান প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছে মানুষকে। এ দায়িত্ব পালন ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বিচারব্যবস্থায় সর্বোতভাবে সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর বিশেষ তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

এরপর যদি দলটি (আল্লাহর হুকমের দিকে) ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।[৩৯]

ইসলামের ন্যায় বিচারের ধারণা এমন যে ন্যায় বিচারের স্বার্থে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এমনকি নিজের বিরুদ্ধেও সত্যের সাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার অথবা নিকটবর্তী অত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চেয়ে বেশি। অতএব, বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কে অবগত।[৪০]

সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে এবং রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা করেছে। অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। ইসলাম এমন প্রগতিশীল ব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে যা কিছু ভালো তার সবই গ্রহণ করে এবং মানবতার জন্য যা কিছু খারাপ ও ক্ষতিকর তার সবই এড়িয়ে যায়। সামজিক শান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সকল বিশৃঙ্খলামূলক কাজ নিষিদ্ধ করেছে। অন্যায়ভাবে যারা মানুষকে খুন করে তাদেরকে আইনসংগত ভাবে হত্যা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এমনকি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে হত্যার চেয়েও জঘন্য হিসেবে ইসলাম অভিহিত করেছে। আল্লাহ্র বিধান দ্বারা উদ্দীপ্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পুরোপুরি টেকসই ও কল্যাণকর।

৩৮. আল-কুরআন, ৪ : ৫৮
৩৯. আল-কুরআন, ৪৯ : ৯
৪০. আল-কুরআন, ৪ : ১৩৫

চার. বৈষম্য দূরীকরণ

দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তদেশীয় বৈষম্য হ্রাস করা, বিশেষ করে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নতির সুফল ভোগের জন্য জাতিসংঘ দরিদ্রদের সহায়তা প্রদানে গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম বিশ্বের সব বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য দূরীভুত করে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ধনী, গরিব, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সাদা, কালো, মুসলিম, অমুসলিম ইত্যাকার কোন পার্থক্য করা হয় না। মানুষ হিসাবে সাধারণভাবে সকলকে সমান মর্যাদা সম্পন্ন মনে করা হয়। আল্লাহ্র সৃষ্টি হিসেবে সকল মানুষকে সমঅধিকার সম্পন্ন মনে করা হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরূপ:

১. লিঙ্গ সমতা: ইসলাম চায় এমন একটি সমাজ তৈরি করতে, যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ থাকবে এবং সমতার ভিত্তিতে সকলে মৌলিক অধিকার ভোগ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾

মুমিন পুরুষ বা নারী যে কেউ সৎকর্ম করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।[৪১]

২. বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ: ইসলামে বর্ণ বৈষম্য ও বংশের শ্রেষ্ঠত্ব বলতে কিছু নেই। কুরআন মাজীদে মানুষকে একজাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৪২] মানুষের মধ্যে দেশ, কাল, বর্ণ, ভাষা ও গোত্রের পার্থক্য দূর করে মহানবী স. বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টন্ত স্থাপন করেছিলেন। যেখানে বৈষম্যের লেশও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، وَلا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلا بِتَقْوَى.

শুধুমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতে ছাড়া অনারবগণের উপর আরবগণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবগণের উপরও অনারবগণের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, একইভাবে লালের উপর কালোর ও কালোর উপর লালেরও কোন মর্যাদা নেই।[৪৩]

৪১. আল-কুরআন, ৪ : ১২৪
৪২. আল্লাহর বাণী: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ, "হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন। আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩
৪৩. আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : কিতাবুল মানাকিব, পরিচ্ছেদ : মান দাওয়াল জাহিলিয়াহ, হাদীস নং, ৪৭

৩. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ: ইসলাম অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য প্রথমত সম্পদের আবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করে। দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানব গোষ্ঠীকে আর্থিক স্বাবলম্বী তৈরির বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যাকাত, সাদকাহ এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। ধনীর সম্পদে গরীবের অধিকার সাব্যস্ত করেই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি, বরং উক্ত অধিকার আদায় বাধ্যতামূলক করেছে। এমনকি অভাবগ্রস্তদের সাথে সদাচরণ করারও নির্দেশ দিয়েছে।

পাঁচ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

জীবনের সাথে সম্পদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর এবং নিবিড়। সম্পদ ছাড়া জীবনে সুখ ও নিরাপত্তা কল্পনা করা যায় না। ইসলামে বরং সম্পদ হলো আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নিয়ামত। ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক তৎপরতায় মানবীয় ও নৈতিক মূল্যবোধগুলোর বেশ ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ খোলা রেখেছে। কিন্তু ইসলামের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সীমিত। মানুষ যাতে বস্তুগত উন্নয়নের পেছনে ছুটতে গিয়ে লোভ-লালসা, অপচয়, জুলুম ও অত্যাচারে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্যই এই সীমাবদ্ধতা রাখা হয়েছে। একজন মানুষের জন্য দুনিয়া ও এর সম্পদগুলো তখনই অপছন্দনীয় যখন তা তাকে খোদাদ্রোহিতার দিকে নিয়ে যায় এবং এর ফলে সে অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও জুলুমের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইসলাম মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কাজে লাগানোর বিরোধী নয়। টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্রের আওতায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৌশলের লক্ষ্য হলো সামাজিক সমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনকে সহজতর করা এবং পরিবেশগত টেকসহিত্বের প্রশ্নে কোন প্রকার আপস না করে অব্যাহত ত্বরান্বিত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা। নিম্নে ইসলামের আলোকে বিষয়টি আলোকপাত করা হলো:

১. যাকাত আদায় করা: ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। যাকাত সমাজের গরীব-দু:খী মানুষের হক। তা আদায় না করলে ব্যাক্তির নিজস্ব উপার্জিত সম্পদ ভোগ ও হালাল হবে না। এ সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যেক বিত্তশালীর সম্পদে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে আল্লাহ তাআলা যাকাত দান ফরয করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে সাথে রুকু কর।[৪৪]

৪৪. আল-কুরআন, ২ : ৪৩

একইভাবে ইসলাম বিশেষ দান তথা সাদকাহকে কখনো ওয়াজিব এবং কখনো ঐচ্ছিক গণ্য করেছে। এ দু'ধরনের দানই ইসলামী সমাজের অভাব দূর করার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾

আর আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদেরকে সম্পদ দান করে।[৪৫]

২. অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ: মানুষ তাঁর প্রয়োজনে অর্থ উপার্জন করবে, ব্যয়ও করবে। তবে কোন ক্রমেই অপচয় করতে পারবে না। মানুষের অর্থনৈতিক দায়িত্ব হলো সে অর্থের অপচয় রোধ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করবে, আহার করবে, পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৪৬]

৩. অভাবী ও দরিদ্রের দান করা: সমাজের সম্পদশালী মানুষের প্রধান দায়িত্ব হলো তারা তাদের সম্পদের উদ্বৃত্ত অভাবী ও দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করবে। এটা গরীবদের প্রতি তাদের অনুগ্রহ নয় বরং অবশ্য পালনীয় দায়িত্বমাত্র। ধনীদের সম্পদ গরীবদের অধিকার ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।[৪৭]

৪. সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা: মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসহনীয় বৈষম্য দূর করার জন্য সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করবে। সুষম বণ্টনের জন্যে আল কুরআনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এভাবে:

﴿ مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

৪৫. আল-কুরআন, ২ : ১৭৭
৪৬. আল-কুরআন, ৭ : ৩১
৪৭. আল-কুরআন, ৫১ : ১৯

আল্লাহ জনপদের অধিবাসীদের নিকট হতে তার রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূলুল্লাহ স. তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তি দেওয়ায় কঠোর।[৪৮]

৫. সুদ বর্জন করা: সমাজ ব্যবস্থায় সুদ একটি অভিশপ্ত পদ্ধতি। এটি শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এতে করে সামগ্রিক স্বার্থ নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। ফলে ইসলাম সুদকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করে। এ ব্যবস্থায় কেউ সুদ দিতেও পারবে না এবং নিতেও পারবে না, এতে মানুষের সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা কোনো পাপী কাফিরকে ভালবাসেন না।[৪৯]

তিনি আরও বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যিই যদি মুমিন হয়ে থাক তবে সুদের বকেয়া ছেড়ে দাও।[৫০]

সুদে কোন সময়ই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় না, আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকে আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তাই বৃদ্ধি পায়।[৫১]

৬. অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ নিষিদ্ধ: ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কারও জন্য অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় হারাম করা হয়েছে। কেউ কারো সম্পদ

৪৮. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭
৪৯. আল-কুরআন, ২ : ২৭৬
৫০. আল-কুরআন, ২ : ২৭৮
৫১. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ না করলে সম্পদের নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয় না, ফলে তা গাণিতিক হারে প্রবৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।[৫২]

৭. সম্পদে ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি: যে কোন ব্যক্তি হালাল পথে সম্পদ উপার্জন করে তার মালিক হতে পারে এবং স্বাধীনভাবে সে সম্পদ ভোগ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾

পুরুষ যা অর্জন করবে সে তা থেকে অংশ পাবে এবং নারী যা অর্জন করবে সে তা থেকে অংশ পাবে।[৫৩]

ছয়. অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে অংশীদারিত্ব বাস্তবায়নের উপায়গুলো আরো কার্যকর করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জাগরিত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেসব ব্যক্তি ও সংস্থা অনেকদিন ধরে কাজ করছে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা। লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণের ক্ষেত্রে এসব ব্যক্তি ও সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা উচিত, কারণ তাদের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা এ কাজে আবশ্যক। ইসলামও জ্ঞানীজন থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহ বলেন:

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾

যদি তোমরা না জান তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও।[৫৪]

এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

১. পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ: ইসলামে মানুষের অন্যতম প্রধান সামাজিক দায়িত্ব হলো মানুষের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং

৫২. আল-কুরআন, ৪ : ২৯
৫৩. আল-কুরআন, ৪ : ৩২
৫৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৩, ২১ : ৭

পারস্পরিক সুসম্পর্ক সংরক্ষণে বিস্তারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সমাজে মানুষের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের অনুপ্রেরণা যোগায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾

মুমিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই।[৫৫]

২. অধীনস্তদের সাথে সদাচরণ করা: অধীনস্ত কর্মচারী, দাস-দাসীরা সাধারণত মানুষের মতোই মানুষ। তাদেরকে মর্যাদা দেয়া, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা মানুষের অন্যতম দায়িত্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾

মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত এবং নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।[৫৬] অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়নে কর্মীর প্রতি সদাচার এর কোন বিকল্প নেই।

৩. কল্যাণকর কাজে অংশীদারিত্ব: ইসলাম সব কাজে অংশীদারিত্বকে সমর্থন করে না। টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে কল্যাণকর কাজে অংশীদারিত্ব ইসলামে স্বীকৃত। বরং এসব কাজে পরস্পরের সহযোগিতাই কাম্য আল্লাহ বলেন:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

তোমরা তাকওয়া ও পুণ্যের কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না।[৫৭]

সাত: মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠী একটি বিশাল সম্পদে পরিণত হতে পারে। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে একটি মানবগোষ্ঠীর সুপ্ত প্রতিভা, প্রচ্ছন্ন শক্তি, লুকায়িত সামর্থ্য, যোগ্যতার প্রসার ঘটে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সহ দারিদ্র নিরসন ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে একটি শিক্ষিত, সুপ্রশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি মানব গোষ্ঠীর উন্নতি ঘটে চারটি বস্তুর সমন্বয়ে আর সেগুলো হলো,

৫৫. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০
৫৬. আল-কুরআন, ৪ : ৩৬
৫৭. আল-কুরআন, ৫ : ২

শিক্ষা-কর্মদক্ষতা, দক্ষতা অনুযায়ী কর্ম-সম্পাদন, কর্মক্ষমতা সৃষ্টি এবং ইতিবাচক কর্মস্পৃহা।[৫৮] উপরোক্ত বিষয়াবলি একটি মানুষের ভিতর তখনই বাস্তবায়ন হবে, যখন তার ভিতর শিক্ষা, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য ও কর্মপ্রেরণার বিকাশ ঘটবে। এই চারটি বিষয়কে রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষভাবে জোর তাগিদ প্রদান করেছে।

টেকসই উন্নয়নের সাধারণ ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা

পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে টেকসই উন্নয়ন বলতে কেবল ভোগ ও মুনাফা অর্জনকেই বোঝায়। পাশ্চাত্য রেনেসাঁর পর ভোগবাদী ও মুনাফাকামী নীতি গ্রহণ করে এবং মানুষকে চরম ভোগবাদী হতে উৎসাহ দেয়া হয়। এ বিষয়টি অর্থনৈতিক তৎপরতায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। পাশ্চাত্যের উন্নয়ন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের বৈষয়িক চাহিদাগুলো মেটানোর ক্ষেত্রে চরমপন্থা গৃহীত হওয়ায় ভোগবাদ লাগামহীনভাবে বেড়েছে। এর ফলে অনেক কৃত্রিম বা অপ্রয়োজনীয় চাহিদাও সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এই চরমপন্থা বা বাড়াবাড়ি বিভিন্ন ধরনের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্যের টেকসই উন্নয়ন মডেলে যান্ত্রিকতাবাদ বা মেশিনিজমের মোকাবেলায় মানুষের মর্যাদা ও ইচ্ছাকে গুরুত দেয়া হয়নি। এটাই টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পশ্চিমা উন্নয়ন মডেলের প্রধান বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। ইসলামে টেকসই উন্নয়নকে নৈতিকতার সাথে সমন্বিত করা হয়েছে। ফলে ইসলামী সমাজে অর্থনৈতিক তৎপরতাগুলো হয় লক্ষ্যপূর্ণ ও যৌক্তিক। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এটা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, ধনসম্পদ বা ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদন তৎপরতা যেন মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন না করে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾

এরা সেইসব লোক যাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামাজ কায়েম ও যাকাত দান হতে বিরত রাখতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।[৫৯]

এ আয়াতে এমন লোকদের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাদের বৈধ বা ইতিবাচক অর্থনৈতিক তৎপরতা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না। এটা স্পষ্ট যে, যারা মহান আল্লাহকে সব সময় স্মরণ রাখে তারা অর্থনৈতিক তৎপরতাসহ যে কোনো কাজেই জুলুম, প্রতারণা এবং দুর্নীতি থেকে দূরে থাকে। এ ধরনের লোকদের জন্যে সব সময় সৌভাগ্য বা সুফল অপেক্ষা করে।

৫৮. সুকেশ চন্দ্র জোয়ারদার, *বাংলাদেশের অর্থনীতি* (ঢাকা, মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২০০৯), পৃ. ৪১২
৫৯. আল-কুরআন, ২৪ : ৩৭

উপসংহার

পরিবেশের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই এবং কোনো দেশই বিচ্ছিন্নভাবে নিজ পরিবেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে এককভাবে নিজের ভবিষ্যৎকে শঙ্কামুক্ত করতে পারে না। এজন্য টেকসই উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের অংশীদারিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ কারণে ইসলামের ন্যায়বিচার, নৈতিকতা, সাম্য, সৌন্দর্যবোধ, ভালবাসা, দেশপ্রেম প্রভৃতি মূল্যবোধ বাস্তবায়নের উপর জোর দিতে হবে। কেননা এই মূল্যবোধ হারিয়ে যাওয়ার কারণেই উন্নয়নের মানবিক অবয়ব আজ ধুলা মলিন হয়ে গেছে। পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের মাধ্যমে দেশের মানব উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সক্রিয়তা প্রয়োজন। এছাড়া প্রশাসনিক জবাবদিহিতা ও পরিকল্পনা কমিশনের সক্রিয় কার্যক্রমের মাধ্যমে সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো জরুরী। ইসলাম এ বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। তাই বলা যায়, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত হলে জাতি পেতে পারে উন্নয়নের স্থায়ী সুফল ও সমৃদ্ধি।